সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

এক মোগল ক্রীতদাসের আত্মকাহিনী

Issue cover not available

Vol. 14 | No. 2 | 1970

Check for updates

Volume	14
Issue	2
Year	1970
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	লুৎফুন্নেসা হবিবুল্লাহ
Published online	December 1, 1970
DOI	10.62328/sp.v14i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v14i2.2
Pages	94-116
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

এক মোগল ক্রীতদাসের আত্মকাহিনী

লুৎফুন্নেসা হবিবুল্লাহ্

[আঠারো শতকের মাঝামাঝি নাদির শাহের আক্রমণের পর দিল্লীর মোগল রাজশক্তি কি দ্রুততার সঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে থাকে-তা ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই জানা আছে। উত্তর ভারতে মারাঠা, জাট ও রোহিলাদের ক্ষমতাবিস্তার ও পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ এবং পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আবদালী আফগানদের উপর্যুপরি আক্রমণের দরুণ, সম্রাটের কর্তৃক প্রায় লোপ পেতে থাকে। মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যে দুইজন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন, দুইজনেই স্ব স্ব মন্ত্রীর দ্বারা অপসারিত ও নিহত হন। পরবর্ত্তী সম্রাট শাহ্ আলম দিল্লীতে স্বীকৃত হলেও ১১ বৎসর কাল ইংরাজের আশ্রয়ে এলাহাবাদে বাস করতে বাধ্য হন। ১৭৬১ সালে পানিপথের যুদ্ধে উত্তর ভারত থেকে মারাঠা শক্তি বিতাড়িত হলেও, কয়েক বৎসরের মধ্যেই সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে তারা আবার ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে, এবং তাঁরই সাহায্যে ও পৃষ্টপোষকতায় শাহ্ আলম, ১৭৭২ সালে দিল্লীতে ফিরে এসে পিতৃ-সিংহাসনে বসেন। তার মূল্য-স্বরূপ সিন্ধিয়াকে প্রধান মন্ত্রী ও রাজ্যের সর্বে-সর্বা করা সত্বেও, শাহ্ আলমের রাজ্যে শান্তি ফিরে এলো না; কয়েক বৎসর পরই রোহিলা-সর্দ্দার গোলাম কাদেরের হাতে, নিজ পরিবার পরিজন সহ তাঁকে অকথ্য লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়,

এবং তাঁর দুই চক্ষু নষ্ট করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে পাঞ্জাব, আবদালী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাবুল, কান্দাহারের সাথে যুক্ত হয়ে যায় কিন্তু সেখানেও শাসন শৃঙ্খলা ফিরে আসেনি। এই ভাঙ্গনের সুযোগ নিয়ে শিখ সর্দারেরা ক্রমাগত-শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এবং আহমদ শাহ আবদালীর পৌত্র, জামান শাহের অনুগ্রহ লাভ করে, রণজিৎ সিং পাঞ্জাবে সর্ব-প্রধান হয়ে ওঠে এবং তার ফলে উনিশ শতকের গোড়ায় পাঞ্জাবে স্বাধীন শিখ রাজত্ব স্থাপিত হয়।

মোগল শক্তির এই ভাঙ্গনের সম-সাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের অভাব নাই, কিন্তু এই সব ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আত্মকাহিনী, যা ইতিহাসকে, জীবন্ত করে তুলতে পারে তেমন রচনা খুব বেশী নাই। এই রকম একটি বিরল আত্ম-কাহিনীর সারানুবাদ, বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। মূল-গ্রন্থ ফার্সি ভাষায় লেখা, নাম "তাহ্মাস নামা" রচনাকাল ১৭৭৯, দিল্লী। নিজ পিতৃদত্ত নাম লেখক জানতেন না; তাঁর মনিবের দেওয়া নাম 'তাহ্মাস' নামেই তিনি আত্মপরিচয় দিতেন। গ্রন্থটির মাত্র একটি পাণ্ডুলিপি বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে (Rieu. Catalogue of Persian Manuscripts in the British Museum, Vol. 111. col. 980 b ; storey, C. A., Persian Literature, section 1l, 800, p, 625.)

অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এই রচনাটি, আমার জ্ঞানমতে একমাত্র যদুনাথ সরকার ব্যতীত আর কেহ ইতিহাস লেখার জন্য উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেন নি।

তাহমাস্ ছিলেন পিতৃ-পরিচয়-বিহীন এক তুর্কী ক্রীতদাস, যাকে শিশুকালে মাতৃক্রোড় থেকে নাদির শাহের সৈন্যরা এশিয়া মাইনরের বায়েজিদ শহর থেকে ধরে নিয়ে আসে। নাদির শাহের মৃত্যুর পর তাঁর একজন সৈন্যের সাথে বালকটি ভারতবর্ষে এলে, পাঞ্জাবের মোগল সুবাদার মুইন-উল্-মুল্‌ক্ তাকে ক্রয় করে নিজ গৃহে প্রতিপালন করেন। ১৭৫৩ সালে মুইন-উল-

মুলকের আকস্মিক মৃত্যুর পর, তাঁর বেগম সাহেবার সেরেস্তায় গৃহদাস হিসাবে থেকে বালক তাহ্‌মাস্ লেখাপড়া, যুদ্ধবিদ্যা ও জমিদারী পরিচালনা প্রভৃতি নানা বিষয় শিক্ষা লাভ করে এবং বিশ্বস্ততা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জন করে। পরে আহম্মদ শাহ্ আবদালীর সৈন্য দলে যোগ দেয় এবং তাঁর পুত্র তৈমুর শাহের কাছ থেকে খান উপাধি লাভ করে। ১৭৭০ সালে তাহমাস খান মোগল সম্রাটের বখ্‌শী, রোহিলা সর্দ্দার জাবিতা খান এবং তার পরে নজফ্‌খানের অধীনে কাজ করে যশস্বী হয় এবং সম্রাট শাহ্‌আলম দরবারের ওমরাহ্‌দের অন্তর্ভুক্ত করে, তাঁকে 'মুহকিম-উদ্দৌলাহ্ তাহ্‌মাস খান ইতিকাদ জঙ্গ্' খেতাব দিয়ে সম্মানিত করেন। শেষ জীবনে তাহ্‌মাস খান প্রচুর বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হয়ে, দিল্লীতে সাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন এবং সেই সময়েই এই আত্ম-কাহিনী রচনা করেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখনীয় যে উর্দু ভাষার বিখ্যাত কবি সাদাৎ ইয়ার খান 'রঙ্গীন', এই তাহ্‌মাস খানেরই পুত্র ; তাঁর নাম এই আত্ম-কাহিনীতে উল্লেখিত আছে। 'রঙ্গীন', উর্দুকাব্যের এক বিশিষ্ট রীতি ও রুচি প্রবর্তন এবং অন্তপুরিকাদের চলিত ভাষা ব্যবহারের জন্য খ্যাত। তিনি কিছুকাল ঢাকাতে ও (জাহাঙ্গীর নগর) বাস করেছিলেন। সম্পূর্ণ তাহ্‌মাস নামার অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হবে।—অনুবাদিকা]

এক

আমার পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস ছিল তুর্কী দেশে। ঐ দেশে বায়াজিদ নামে এক শহর ছিল, শহরের আট ক্রোশ দূরে ছিল আরজাৎ নামের গ্রাম। এই গ্রামেই ছিল আমার বাড়ী আর আমি এখানেই জন্মাই। খুব শিশু-কালেই আমাকে এই গ্রাম থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, তাই সেই সময় গ্রামের সকলে আমায় কি নামে ডাকতো তা আমার সঠিক মনে পড়েনা। আমার মা বাবার নাম ও তাই আমার মনে নাই।

নবাব জুলফিকারুদ-দৌল্লাহ্‌, নাজাফ খান বাহাদুরের (দিল্লীর প্রধান মন্ত্রী ১৭৭২—১৭৮২) সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক গড়ে উঠায়, পারস্য দেশের অনেক লোকের সঙ্গে এবং তুর্কী দেশের বেশ কিছু মানুষজনের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছিল। এঁরা আমাকে আমার পূর্বরুষদের আদি নিবাসের কথা মনে করিয়ে দেন। নবাব প্রায়ই আমাকে, আমার জন্মসূত্রের এবং আমার গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করতেন। অন্যেরাও আমাকে ঐ একই প্রশ্ন বারে বারে করতেন। কেউ কেউ মনে করতেন যে আমি আরমেনিয়াম ছিলাম, আবার কারো কারো মতে আমার খারিজিধর্ম্ম সম্প্রদায়ভূক্ত হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা ছিল। কেউ কেউ বলতেন আমি কুর্দ্দি জাতীয় লোক, আবার অন্যেরা বলতেন, আমি নিশ্চয় ইসমালু উপজাতিতে জন্মেছিলাম। যেহেতু উপরোক্ত জাতির লোকেরা, আমি যে প্রদেশ থেকে এসেছি, সেই প্রদেশেই বাস করত—অতএব লোকে ধরে নিয়েছিল ষে আমি অবশ্যই এদেরই কোন এক গোষ্ঠিভূক্ত হব।

অতি বাল্যকালে আমার মা-বাবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার দরুণ, আমার বংশ পরিচয় বা আমার নিজের জাতের সম্বন্ধে, কোন কথাই আমার মনে পড়ে না। নবাব ও অন্যান্য সকলের প্রশ্নের জওয়াবে আমি এটা তাদের বলেছিলাম যে ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি আমার বরাবর গভীর অনুরাগ থাকায় আমার মনে হয় যে আমি শিশুকাল থেকে মুসলমানই ছিলাম।

পারস্যের নাদির শাহের সঙ্গে তুর্কার সুলতানের যুদ্ধ শুরু হলে, নাদির শাহের সৈন্যরা আমাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে যায়। সেই সময় তারা গ্রামের ভেতর লুটপাট করে সব কিছু তছনছ্‌ করে দেয় এবং গ্রামবাসীর উপর আরও যা যা চরম অত্যাচার করে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সারা গ্রামের ওপর দিয়ে তখন নানা অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চলছিল; সেইসময় আমার মা আর বড় ভাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী থেকে বার হয়ে আসেন। হঠাৎ এক ঘোড়সওয়ার আমাদের তিনজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লোকটি আমাকে আমার ভাই এর কোল থেকে ছিনিয়ে নেয় বলে আমার মা আর আমার বড় ভাই চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে তার পেছন পেছন দৌঁড়ে আসতে থাকেন। সেই সময় অন্য এক জন ঘোড়-সওয়ার আমার ভাইকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে; তাই দেখে আমার মা আমার ভাইকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করতে আরম্ভ করেন, আর সেই সুযোগে লোকটি ঘোড়া ছুটিয়ে আমায় নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ে। সেই থেকে আমার মা আর ভাইএর কোন সংবাদই আমি আর পাইনি।

সৈন্যরা এক ঘণ্টা ধরে গ্রামের উপর লুটতরাজ চালাবার পর গ্রামবাসীদের অনেককে তাদের তাঁবুতে ধরে নিয়ে যায়। নাদির শাহের তাঁবুতে পৌঁছাতে তাদের তিন দিন সময় লাগে; সেখানে পৌঁছলে, নাদির শাহ্ তাঁর সামনে সব বন্দীদের হাজির করতে আদেশ দেন। বন্দীদের তাঁর সামনে আনা হলে অনেককে তিনি মুক্তি দেন।

আমাকে যে ঘোড়-সওয়ার লুট করে নিয়ে গিয়েছিল সে কিন্তু আমাকে নাদির শাহের সামনে নিয়ে যায় নি, তার বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছিল। সেই সেনাটি ছিল খরোঞ্জিবেগ নামে এক সৈন্যাধ্যক্ষের ভাই। খরোঞ্জিবেগ তারপর আমাকে তার ভাই এর কাছ থেকে নিয়ে, নিজের কাছে রেখে নিজপুত্রের মত লালন পালন করতে থাকেন। আমায় তিনি খুবই ভালবাসতেন এবং আমায় 'জাকির' নামে ডাকতেন। আমাকে লেখাপড়া শেখবার জন্যে তিনি দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

কয়েক মাস পর নাদির শাহ্ খরোঞ্জিবেগকে আদেশ করেন, গীলান প্রদেশের রাজস্ব আদায় করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য। নাদির শাহের আদেশ অমান্য করার দুঃসাহস কারো ছিল না। তাই খরোঞ্জিবেগ অবিলম্বে গীলান প্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়েন। পথে কোনখানে না থেমে তিনি সোজা গীলানে পৌঁছান এবং খাজনা আদায় করে নাদির শাহের কাছে পাঠিয়ে দেন।

এতদিন খরোঞ্জিবেগ অবিবাহিত ছিলেন, এই সময় তিনি এক সর্দ্দারের মেয়েকে বিবাহ করেন। এর কয়েকমাস পর খুব ধুমধামের সঙ্গে আমার সুন্নৎ দেওয়া হয়। খরোঞ্জিবেগের অগাধ স্নেহ ভালবাসা, আমাকে আমার মা-বাবার অভাব ভুলিয়ে দিয়েছিল। খরোঞ্জিবেগ বোখারার অধিবাসী ছিলেন, তার অধীনস্থ সবাই ঐ প্রদেশের উজবেগ জাতীর লোক ছিল।

এরপর দুই বছর কেটে যায়। হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে নাদির শাহ্ নিহত হয়েছেন (৯ই জুন, ১৭৪৭ খ্রীঃ)। নাদির শাহের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র, সাম (sam) নামের এক শাহ্জাদা, তাব্রিজ শহরে নিজেকে বাদশাহ্ বলে ঘোষণা করেন। সাফাভি রাজবংশের সঙ্গে নাকি তার রক্ত সম্পর্ক ছিল।

নাদির শাহ্ তার জীবনকালে, আমীর আর্সালান খান, কুরবান্ বেগ খান উজবেগ, আল্লাইয়ার খান ও নাসির খান বেলুচকে এক বিরাট সেনাদলের সঙ্গে আরদান প্রদেশের দিকে পাঠিয়েছিলেন। নাদির শাহের মৃত্যু সংবাদ শোনা মাত্র তাঁরা সকলে মিলে সেখান থেকে চলে আসেন; সমস্ত উজবেগ সেনাদের প্রধান ছিলেন কুরবান বেগ খান। তিনি খরোঞ্জি-বেগকে, তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে অনুরোধ করে এক পত্র পাঠান। পত্র পেয়ে খরোঞ্জিবেগ রওয়ানা হয়ে পড়েন ও পথের নানা বিপদ আপদ অতিক্রম করে তাব্রিজ শহরে এসে পৌঁছান।

খরোঞ্জিবেগের তাব্রিজে পৌঁছানোর সংবাদ, বাদশাহ্ সামের কানে পৌঁছায়। তিনি খরোঞ্জিবেগকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আমন্ত্রণ জানান কিন্তু খরোঞ্জিবেগ সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তাঁকে জোর করে বাদশাহের সামনে উপস্থিত করা হয়। বাদশাহ তাঁকে বলেন "তোমার উচিৎ আমার সঙ্গে যোগদান করা; আমি আমীর আরসালান খান ও কুরবানবেগ খানকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং তাঁরা শীঘ্রই আমার সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন।" খরোঞ্জিবেগ চিন্তা করে দেখলেন যে সে অবস্থায় বাদশাহের কথা মত চলাই বুদ্ধির কাজ হবে।

তারপর বাদশাহ্ খরোঞ্জিবেগের সৈন্যদের পরীক্ষা করে দেখার জন্যে, তাদের সকলকে তাঁর সামনে আনার আদেশ করলেন। ঐ সময় খরোঞ্জিবেগ চর্ম্মরোগে ভুগছিলেন তাই তিনি ঘোড়ায় চড়তে পারতেন না। তাঁর ভাই আমাকে বাদশাহের কাছে নিয়ে যান। আমি ও তখন ভাল মত ঘোড়ায় চড়তে শিখিনি; যাবার পথে একবার যখন ঘোড়া লাফ মেরে ওঠে, তখন আমি প্রায় ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কয়েকজন লোক আমায় সময় মত ধরে ফেলায় সে যাত্রায় আমি প্রাণে বেঁচে যাই। মোট কথা, এই সময় আমরা সবাই বাদশাহ্ সামের দলভুক্ত হয়ে যাই। শহরের ভেতর আমাদের বাসস্থান ঠিক করে দেওয়া হয়। শহরবাসীরা কিন্তু আমাদের পর্‌দেশী ভেবে, কুনজরে দেখতো এবং ঘৃণা কোরত।

এর কয়েকদিন পরই আমীর আরসালান খান এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে, তাব্রিজের কাছাকাছি এসে পৌঁছান। বাদশাহ্ সাম্ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্যে কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে আমীর আরসালান খানের কাছে পাঠান। ঐ সব লোকদের ওপর বাদশাহের নির্দ্দেশ ছিল, তাঁরা যেন আমীর আরসালান খানকে বিশেষ ভাবে পীড়াপীড়ি করে বাদশাহের দলে যোগদান করার জন্যে। কিন্তু আরসালান খান সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হলেন না। এর ফলে দুই দলে যুদ্ধ বেধে যায় এবং কয়েকদিন ধরে সেই যুদ্ধ চলতে থাকে! ক্রমে বাদশাহ্ সামের সেনারা হেরে যেতে আরম্ভ করে এবং শহরের দিকে পিছু হটতে থাকে। পরের দিন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, বাদশাহ খরোঞ্জিবেগকে আদেশ করেন তাঁর সেনাদল নিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করতে। সেই আদেশ মত, খরোঞ্জিবেগের অধীনস্থ সৈন্যরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে এবং খরোঞ্জিবেগ অসুস্থ থাকায়, তাঁর ভাই সেনাদল পরিচালনা ক'রে যুদ্ধ স্থলে নিয়ে যান। দুই দলে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খরোঞ্জিবেগের সৈন্যরা বাদশাহের দল ত্যাগ করে ও তাদের স্বজাতীয়, অন্যদলের উজবেগ সেনাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমীর আরসালান খানের সৈন্যরা, বাদশাহ্ সামের সৈন্যদলকে

আক্রমণ করে শহরের প্রাচীর পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে যায়। উজবেগ সৈন্যদের দলত্যাগের কথা জানতে পেরে বাদশাহ্ শহরের বাকি সব উজবেগদের দেখা পাওয়া মাত্র হত্যা করতে ও তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ পেয়ে কিজিলবাস সেনারা শহরের সর্বত্র উজবেগদের আক্রমণ ও হত্যা ক'রে বেড়াতে লাগল। তারা আমাকে ও খরোঞ্জিবেগকে বেঁধে তাদের বাসস্থানে নিয়ে গেল। সন্ধ্যায় খরোঞ্জিবেগ তাদেরকে বল্লেন 'আমার স্থির বিশ্বাস যে তোমরা আমায় হত্যা করবে; আমার একমাত্র অনুরোধ এই যে তোমরা এই বালকটিকে (অর্থাৎ আমাকে) প্রাণে মের না। ও আমার পুত্র নয়; বায়াজিদে যুদ্ধের সময় ওকে বন্দী করে আনা হয় এবং ওকে আমি লালন পালন করেছি।' তাঁর এই অনুরোধে কিজিলবাস সেনাদের মন গলে যায় এবং তারা তাঁকে কথা দেয় যে আমাকে তারা হত্যা করবে না।

এই সময় ভিতরের কামরা থেকে খরোঞ্জিবেগের স্ত্রীকে কাঁদতে শোনা যায়। তাঁকে কাঁদতে শুনে কিজিলবাস সেনারা, আমাকে সেই কামরার ভেতর গিয়ে, আমার মায়ের (খরোঞ্জিবেগের স্ত্রীর) সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়; আমাকে দেখামাত্র তিনি আমাকে বুকে চেপে ধরেন। কিছুক্ষণ পর কিজিলবাস সেনারা আমাকে ও আমার মাকে অন্য এক বাড়ীতে নিয়ে যায়। সেই বাড়ীতে যাবার সময় আমরা বুঝতে পারলাম যে খরোঞ্জিবেগকে ইতিমধ্যে হত্যা করা হয়েছে; তাঁর মৃতদেহ আমরা পথ-পার্শ্বে পড়ে থাকতে দেখি এবং এক ঝলক তাঁর দিকে তাকিয়েই আমরা তাঁকে চিনতে পারি। তিনি চর্ম্মরোগে ভুগছিলেন বলে, এক দুর্গন্ধময় মলম তাঁর দেহে লাগান হতো। ঐ মৃতদেহ থেকে ঐ ধরনের দুর্গন্ধ বার হতে দেখে আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম যে, যে মৃতদেহটা আমরা পথপার্শ্বে পড়ে থাকতে দেখেছি তা খরোঞ্জিবেগের মৃতদেহ। পরেরদিন যুদ্ধ যখন পুনরায় শুরু হ'ল, আরসালান খান তাব্রিজ শহর আক্রমণ করলেন। প্রতিরোধ করতে না পেরে, বাদশাহ শহর ছেড়ে পলায়ন করলেন। জয়লাভ করার পর আরসালান খান শহরে আইন শৃঙ্খলা

ফিরিয়ে আনার কাজে ব্যাপৃত হলেন। আমায় যারা বন্দী করে রেখেছিল, রাত্রে তারা আমায় অন্য এক স্থানে পাঠিয়ে দিল। ঐ সময়ই আমি জানতে পারি যে খরোঞ্জিবেগের স্ত্রীকেও কিজিলবাস সৈন্যরা হত্যা করেছে। বয়স কম দেখে দয়াপরবশ হয়ে তারা আমাকে হত্যা করেনি।

কয়েকদিন পর কুরবানবেগ, শহরের বিভিন্ন এলাকার সর্দারদের ওপর এই আদেশ জারী করলেন ঃ খরোঞ্জিবেগকে যদি হত্যা করা হয়ে থাকে তাহলে তাঁর স্ত্রী পুত্রকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তোমাদের খুঁজে বার করতে হবে, তাঁর কি কি সম্পত্তি ছিল, সে বিষয়েও তোমরা যথাযথ অনুসন্ধান কর।" তার এই আদেশ পাওয়া মাত্র সর্দারদের লোকেরা প্রতি এলাকায় অনুসন্ধানের কাজ চালাতে লাগল; যেখানেই তারা খরোঞ্জিবেগের অস্থায়ী সম্পত্তি দেখতে পেল তখনই সেগুলো উঠিয়ে কুরবান বেগের কাছে নিয়ে গেল। এই সংবাদ শোনামাত্র আমাকে যারা বন্দী করে রেখেছিল সেই কিজিলবাস সৈন্যরা মাটির নীচের এক কামরায় আমাকে লুকিয়ে রাখলো। আমাকে তারা খুবই সামান্য খেতে দিত। এই অবস্থায় সেখানে আমায় চারদিন কাটাতে হয়েছিল

খরোঞ্জিবেগের স্ত্রীপুত্রের অনুসন্ধানের কাজ আরও বৃদ্ধি পাওয়াতে, যেখানে কিজিলবাস সৈন্যরা আমাকে লুকিয়ে রেখেছিল সেখান থেকে অন্য এক বাড়ীতে স্থানান্তরিত করে। তারা আমায় নিজ বাসস্থানে নিয়ে যায় এবং সেই সন্ধ্যায় ঠিক করে যে বাড়ীর এক নিভৃত কোণায় নিয়ে গিয়ে আমায় তারা হত্যা করবে। কিন্তু আমার নিয়তিতে তখন মৃত্যু লেখা ছিলনা, তাই তারা মত পরিবর্তন করে আমাকে শহরের বাহিরে নিয়ে যায়।

সেই সময়ে শহরের কর্তৃপক্ষরা জ্বালানিকাঠ ও পশুদের খাবার সংগ্রহ করার জন্য কিছু লোককে উট নিয়ে শহরের বাইরে পাঠিয়েছিল। শহরের ধারে যে ফলের বাগান ছিল, তার পাশ দিয়েই তারা যাচ্ছিল। এই বাগানে প্রচুর পাকা তরমুজ ও খরবুজা ধরেছিল। তাই দেখে দলটির মনে দারুণ লোভ জন্মায় ও তারা বাগানে ঢুকে ফলগুলো পেড়ে খেতে আরম্ভ করে, কেউ

কেউ স্থির করে যে কিছু ফল তারা বাড়ীতেও নিয়ে যাবে। বাগানের মালিক তার বাগানের ওপর এই উপদ্রব দেখে শহরে দৌড়ে যায় ও উপরওয়ালার কাছে উটবাহকদের এই ধ্বংসাত্মক কাজের সম্বন্ধে নালিশ জানায়। উপরওয়ালাএই নালিশ পেয়ে দারুণ ক্রোধে ফেটে পড়েন, এবং অপরাধীদের শায়েস্তা করার জন্য তক্ষুনি অকুস্থলে সৈন্য পাঠাবার আদেশ দেন। সৈন্যদের এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে যার হাতে ঐ বাগানের ফল দেখা যাবে সৈন্যরা তাকে গ্রেফতার করে, বেশ করে প্রহার লাগাবে। আদেশ পেয়ে সৈন্যরা বাগানের কাছে এক রাস্তার উপর অপেক্ষা করতে থাকে, তামাশা দেখার জন্য সেখানে অন্যান্য অনেক লোকও জমা হয়। যে সব লোকেরা বাগানের ফল হাতে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়েছিল, তারা সৈন্যদের আসার খবর পেয়ে হাতের ফলগুলো এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যে যে দিকে পারে দৌড়ে পালাতে আরম্ভ করলো। আশে পাশের লোকেরা তখন সেই সব ফেলে দেওয়া ফলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং সে গুলো কাড়াকাড়ি করে খেতে আরম্ভ করে।

আমাকে যারা লুকিয়ে শহরের বাহিরে নিয়ে যাচ্ছিল, তারাও ঐসব লোকদের দলে যোগ দেয়। ক্রমে রাতের আঁধার নেমে আসে অন্ধকারে আর শহরে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। দেখে, তারা ফলের বাগানের ভেতর ঢুকে সেখানেই রাত কাটান স্থির করল। আমি তখন তাদের সঙ্গেই ছিলাম।

যখন দেখলাম যে বাগানের ভিতর তারা রাতের আস্তানা ঠিক করে নিয়েছে, তখন শৌচকর্মের জন্য আমি তাদের অনুমতি প্রার্থনা করি। সহজেই অনুমতি পেয়ে আমি কিছু দূরে বাগানের এক কোণার দিকে চলে যাই এবং সেখান থেকে দেখতে পাই যে বাগানের প্রাচীরটা বেশ নীচু। আমি তখন হঠাৎ মন স্থির করে ফেললাম এবং এক লাফে পাঁচিল পেরিয়ে বাগানের বাহিরে চলে এলাম। বাইরে এসেই আমি প্রাণপণে দৌড়াতে আরম্ভ করি সেই সময় একদল সেনা শহরের দিকে যাচ্ছিল, আমিও তাদের সঙ্গে শহরের দিকে যেতে লাগলাম। নিজ শিবিরে পৌঁছানর পর তারা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা

করে ; আমি তখন আমার কাহিনী সবিস্তারে তাদের কাছে বর্ণনা করি। সব কথা শুনে সেই সৈন্যাধ্যক্ষ আমায় তার তাঁবুতে রাত কাটাবার অনুমতি দিলেন। পরের দিন সকালে যখন আমি তাঁর তাবুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন সেনাদলের ভেতর খরোঞ্জিবেগের কয়েকজন সেনাকে দেখতে পেলাম। তাদের দেখে আমি নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে চিৎকার করে কাঁদতে থাকি। ঐ সেনারা তখন আমায় চিনতে পারে এবং সঙ্গে ক'রে উপরওয়ালার কাছে নিয়ে যায়। সেখানেও আমি যাবতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি করি। তিনি তখনই এক অনুসন্ধানী দল পাঠালেন। যে বাড়ীতে আমাকে আটক করে রাখা হয়েছিল সে বাড়ীটা আমি দেখিয়ে দিলাম। সে বাড়ীর কয়জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে বন্দী করা হল ; পরে শহরের শাসন কর্ত্তা কুরবান বেগ খান স্ত্রীলোকটিকে মুক্তি দেবার আদেশ দেন। কিন্তু ঐ বাড়ীর পুরুষদের সমস্ত ধন সম্পত্তি বাযেয়াপ্ত করা হয়। আমি ভেবেছিলাম যে খরোঞ্জিবেগের ভাই জীবিত আছেন, কিন্তু সে সময় জানতে পারলাম যে তাঁকেও পরে হত্যা করা হয়েছিল। তবে খরোঞ্জিবেগের এক পালিত ভ্রাতা আমায় চিনতে পারেন এবং সঙ্গে করে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান।

আমির আরসালান খান সেই সময়ে তাব্রিজে রয়ে যান। অন্যান্য সৈন্যধ্যক্ষরা (কুরবান বেগ খান উজবেগ, নাসির খান বেলুচ, এবং আল্লাহ ইয়ার খান আফগান) শহর ত্যাগ করে চলে যান। নাসির খান বেলুচ, বেলুচিস্তান সীমানা পর্যন্ত সৈন্যদলের সঙ্গে থাকতে রাজী হন। আল্লা-ইয়ার খান, তাদের কান্দাহার অবধি নিয়ে যেতে সম্মত হন। কুরবান বেগ বললেন যে তিনি সেখান থেকে তুর্কিস্তানের (অক্সাসের অপর পারের) দিকে রওয়ানা হবেন।

নিজের নিজের গন্তব্য ঠিক করে নিয়ে তারা সকলে তাব্রিজ ত্যাগ করলেন। ওঁদের দলের সঙ্গে, ওঁরা আমাকেও নিয়ে গেলেন। পথে সৈন্যরা বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে ঢুকে লুটতরাজ চালিয়ে যেতে থাকল। সে যাত্রায় সৈন্যদের অনেক খানি কষ্টকর পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল ; এমন সব অঞ্চল দিয়ে তাদের যেতে হচ্ছিল, যেখানে সামান্যতম খাদ্য সংগ্রহ করতে তাদের ভয়ানক কষ্ট করতে হত।

তাই ক্রমে ক্রমে লোকজন ও ঘোড়াদের অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পড়ল। পথে আল্ওয়ান্দ (Alwand) ও আল্-বুরজের (Alburz) মত অত্যুচ্চ পাহাড় ও সুগভীর উপত্যকা আমাদের চোখে পড়েছিল। কোন রকমে খাদ্য-সামগ্রী যোগাড় করা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছিল ; পানীয় জলও ছিল ময়লা ও বিস্বাদ, এবং স্থানীয় অধিবাসীরা সুযোগ পেলেই আমাদের আক্রমণ করত। এইভাবে পথ চলতে চলতে আমাদের বহু লোকজন মারা যায়। অনেকের ঘোড়া মারা যাওয়ার ফলে বাকি রাস্তাটা তাদের পায়ে হেঁটেই পার হতে হচ্ছিল ; যাদের ঘোড়া বা খচ্চর তখন সুস্থ ছিল তারা কিছুটা আরামের সঙ্গে পথ অতিক্রম করতে পেরেছিল।

অবশেষে আমরা সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছলাম। সেখানে নাসির খান বেলুচ, কুরবান বেগ খান, আল্লাহ্ ইয়ার খানকে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করতে বিদায় দিলেন। তবে উজবেগদের ভেতর বাল্টিবেগ ও মোহাম্মদ বেগ নামে দুজন সেনানায়ক, দুই হাজার সৈন্য নিয়ে লাহোরের দিকে যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

কুরবান বেগ খানের দলভুক্ত হাসান বেগ নামক এক ব্যক্তির দাসরূপে আমি দলের সঙ্গে ছিলাম। আমার এই মনিবটির বেশ কয়েকটি ঘোড়া পথে মারা যায়, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পায়ে হেঁটে অতটা পথ পাড়ি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, অথচ আমাকে দেওয়ার মত একটা বাড়তি ঘোড়াও তাঁর ছিল না। উপায়ন্তর না দেখে তিনি আমাকে আওরাজ বেগ নামক আর একজন সৈন্যাধক্ষ্যের হাতে সঁপে দিলেন ; আমাকে হস্তান্তর করার ব্যাপারে তিনি আওরাজ বেগ খানের কাছ থেকে কোন টাকা-কড়ি নিয়েছিলেন কিনা, তা অবশ্য আমার জানা নাই।

আওরাজ বেগ খানেরও অনেকগুলো ঘোড়া মারা গিয়েছিল, তবে তাঁর একটা গাধা ছিল, যা অবরোহণ ও মালবহন, দুই কাজের জন্যই ব্যবহার করা হত। প্রতিদিন আমি এই গাধার পিঠে চড়ে যেতাম ; অবশ্য তার পিঠে কিছু

মালও চাপিয়ে দেওয়া হত। আমার এই মনিবটি খুবই নির্দয় প্রকৃতির লোক ছিলেন। আমার প্রতি তাঁর এতটুকু করুণা ছিল না। আমাকে তিনি প্রায়ই পানি আনতে ও জ্বালানি সংগ্রহ কোরতে পাঠাতেন ; তাঁর কাছে থাকা কালে আমার কষ্টের সীমাপরিসীমা ছিলনা।

এইভাবে দুই হাজার সেনার এই দলটি পথ অতিক্রম করতে থাকল। অনেক পথ পার হয়ে এবং বহু দুর্ধর্ষ উপজাতীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে দলটি মুলতানে এসে পৌঁছায়। পথের এই সব সংঘর্ষের ফলে দলের অনেক সৈন্য ক্ষয় হয়েছিল। দলটি যখন মুলতানে পৌঁছায়, তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র এক হাজারে। মুলতানে পৌঁছে তারা সেখানকার শাসন কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও তাঁর সৈন্যদলে নিযুক্ত হয়।

দুই

নাদির শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আহম্মদ শাহ্ আবদালি যখন কান্দাহারে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন লাহোরের পরিস্থিতি এইরূপ ছিল :

সম্রাট মোহাম্মদ শাহের পক্ষে তখন পাঞ্জাবের সুবাদার ছিলেন মোহাম্মদ জাকারিয়া খান ; সাধারণতঃ খানবাহাদুর নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর শাসনকালে, মোটামুটি ভাবে প্রদেশে শান্তি বিরাজ করত। তাঁর মৃত্যুর পর (১লা জুলাই ১৭৪৫ খৃঃ অঃ) তাঁর দুই পুত্রের ভেতর যুদ্ধ বেধে যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল ইয়াহিয়া খান ও কনিষ্ঠের নাম শাহনাওয়াজ খান। দুইজনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শাহনাওয়াজ খান ইয়াহিয়া খানকে পরাস্ত ও বন্দী করেন (২১ মার্চ ১৭৪৭ খৃঃ অঃ) এবং প্রদেশ শাসন করতে আরম্ভ করেন।

শাহনাওয়াজ খান চল্লিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং একদল সুদক্ষ গোলন্দাজ সৈন্য তাঁর ছিল। তাঁর সৈন্যদলে দশ হাজার সুসজ্জিত ও উচ্চ বেতনভোগী উজবেগ সেনাও ছিল। যদিও তিনি ভারতবর্ষের একজন আমীর মাত্র ছিলেন কিন্তু এত বড় সৈন্য অধীনে থাকায়, তাঁর

অহমিকা এতদূর বেড়ে যায় যে চরম নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়ে তিনি এক দূত মারফৎ আহম্মদ শাহ আবদালীর নিকট নিম্নলিখিত কথা গুলি বলে পাঠান :

"আপনি যদি লাহোর আসেন আমি আপনার দলে যোগদান করব এবং তাহলে আপনি হিন্দুস্থান জয় করতে সমর্থ হবেন। এতে আমার একমাত্র সর্ত্ত এই যে আমাকে আপনার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করতে হবে। আপনি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহলে আমি সারা হিন্দুস্থানকে আপনার করতলগত করে দিতে পারি।"

আহম্মদ শাহ্ আবদালি শাহনাওয়াজ খানের কাছ থেকে প্রস্তাব পেয়ে অত্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠেন। তিনি এই সংবাদে এত খুশী হয়ে উঠলেন যে মনের আনন্দ চেপে রাখা তাঁর পক্ষে যেন দুষ্কর হয়ে উঠলো। দশ হাজার সৈন্য সমাবেশ করে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে লাহোরের কাছে এসে পৌঁছান। (১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৭৪৮ খৃ: অ:)।

আহম্মদ শাহের সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতা দেখে শাহওয়াজ খান নিজের পূর্ব প্রতিশ্রুতি বর্জন করে আফগানদের বিপক্ষ হয়ে তাদেরকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে (১১ জানুয়ারী ১৭৪৮) তিনি দিল্লীর দিকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। আহম্মদ শাহ্ আবদালী তখন লাহোর শহর দখল করে সেখানকার শাসনের ব্যবস্থা করার পর নিজে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন।

সম্রাট মাহমুদ শাহ্ আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণের এই তোড়জোড়ের সংবাদ পাওয়া মাত্র, তাঁর পুত্র আহম্মদ শাহ্ ও উজির কামরুদ্দিনের অধীনে এক বিরাট সেনাদল পাঠান। আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে (মানুপুরের যুদ্ধ ১১ই মার্চ ১৭৪৮ খৃঃ অঃ) উজির কামরুদ্দিন নিহত হন কিন্তু তার পুত্র মুইন-উল-মুলক খুব সাহসিকতার সঙ্গে আফগানদের আক্রমণ করেন ও তাদের পরাস্ত করেন।

এরপর আফগানেরা পাঞ্জাব ত্যাগ করে চলে যায়। ভূতপূর্ব উজির কামরুদ্দিনের পুত্র মুইন-উল-মুলককে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত

করা হয়। এর কিছুদিন পরই (১৫ই এপ্রিল ১৭৪৮ খ্ঃ অঃ) সম্রাট মুহম্মদ শাহের মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র আহম্মদ শাহ তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মুইন-উল-মুলক লাহোরে পৌঁছে প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন।

মুলতানে আমার প্রভু উজবেগ সেনাপতিরা দুই হাজার সৈন্যসহ সেখানকার শাসনকর্ত্তার অধীনে চাকুরিতে ভর্ত্তি হয়েছিল। যখন তারা শুনল যে মুইন-উল-মুল্‌ক্ লাহোরের শাসনভার গ্রহণ করেছেন এবং আরো সৈন্য সংগ্রহ করছেন তখন তারা তাদের সেনাদল সহ মুলতান থেকে লাহোরে এসে উপস্থিত হল। তাদের ক্রীতদাসরূপে আমিও তাদের অনুসরণ করলাম।

লাহোরে পৌঁছে শাহাবুদ্দিন বেগ ও মোহাম্মদ নাজির বেগ নামে দুইজন সেনাপতি নিজেদের ভেতর পরামর্শ করে স্থির করল যে কোনও ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে তাদেরকে কাজের অনুসন্ধান করতে হবে। তারা শুনেছিল যে, সৈয়দ জমিলুদ্দিন খান ও মোহাম্মদ সাইদ খান মুইন-উল-মুল্‌কের অত্যন্ত সম্মানিত ও অন্তরঙ্গ লোক। তারা এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করে তাদের সাহায্য ভিক্ষা করে। সৈয়দ জমিলুদ্দিন খান ও মোহাম্মদ সাইদ খান উজবেগ সৈন্যাধ্যক্ষদের বললেন: 'আগামীকাল আমরা শাসনকর্ত্তার সঙ্গে আপনাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেব। আপনারা মুইন-উল-মুল্‌কের জন্য কিছু মূল্যবান উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে আসবেন।'

একথা শোনার পর তারা নিজ বাসস্থানে ফিরে এসে আলোচনা করতে থাকে, পারস্য দেশের কী উপঢৌকন শাসনকর্ত্তাকে দেওয়ার উপযুক্ত হতে পারে। অনেক গবেষণার পর তারা এই সিদ্ধান্ত করে যে আমাকে (অর্থাৎ গ্রন্থকার তাহমাশ্‌কে) এবং আরও দুজন বালককে তারা উপঢৌকন হিসাবে শাসনকর্ত্তাকে প্রদান করবে। এই সিদ্ধান্ত মত পরদিন তারা আমাকে সহ তিনজন বালককে শাসনকর্ত্তার হাতে সোপর্দ্দ করে। শাসনকর্ত্তা সৈন্যাধ্যক্ষদের সঙ্গে খুবই সহৃদয় ব্যবহার করেন এবং উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ দিয়ে তাদেরকে তাঁর সৈন্যদলে ভর্ত্তি করে নেওয়ার নির্দ্দেশ দেন।

রাতের আঁধার নামার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তিন বালককে মুইন-উল মুল্কের প্রাসাদের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাসাদের ভিতরের ঐশ্বর্য এবং চারদিকের চোখ ধাঁধান বাতির রোশনাই, আমাদের একেবারে হতবাক করে দেয়। এ রকম জাঁকজমক আমরা আর কখনও দেখিনি। আমাদের বয়স তখন মাত্র আট কি নয় বৎসর, আর তখন আমরা তুর্কী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষাও বুঝতে পারতাম না। প্রাসাদে, মুহররাম খান নামে একজন প্রধান পরিচারক (খাজা) ছিল; সে তুর্কী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতে পারত। সে আমাদেরকে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল, তাতে আমরা কিছুটা আশ্বাস পেলাম।

মুইন উল্ মুল্ক্ যখন লাহোরের শাসন ভার গ্রহণ করতে এলেন তখন জলন্ধর দোয়াবের সহকারী শাসনকর্ত্তা আদিনা বেগম খান, মীর মোমিন খান এবং দেওয়ান লখপৎ রায় এর মত পদস্থ ব্যক্তিরা তাঁকে স্বাগতম জানান। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা মুইন-উল্-মুলকের মত সজ্জন ব্যক্তির অধীনে চাকুরী পেয়েছিলাম। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে মোগলদের (উজবেগদের) শিবিরে আমাদের সমবয়সী আর ছেলে আছে কিনা। আমি উত্তর দিয়েছিলাম "আমাদের বয়সের অনেকগুলি ছেলে থাকার কথা।" এ কথা শুনে তিনি উজবেগদের কাছ থেকে আরও পাঁচটি ছেলে নিয়ে উজবেগ ছেলেদের একটা দল গড়ে তুললেন। প্রতিদিন দেওয়ানখানার নির্দ্ধারিত স্থানে অপেক্ষা করে থাকার জন্য আমাদের নির্দ্দেশ দেওয়া হলো। জানি নামক এক ব্যক্তিকে আমাদের তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত করা হলো। প্রাসাদের রন্ধনশালা থেকে আমাদের জন্য তিনবার করে খাবার আসত এবং আমরা প্রাণভরে সে সব উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী উপভোগ করতাম। ব্যবহারের জন্য প্রাসাদ থেকে উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ, নিয়মিত ভাবে আমাদের সরবরাহ করা হত।

আমাদের শিক্ষাদানের জন্য একজন শিক্ষকও নিযুক্ত করা হয়েছিল। 'সুবাদার সাহেব ডেকেছেন'— এই মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে, প্রায়ই অনেক

ছেলে পড়ায় ফাঁকি দিত আর ঐ সব ছেলেদের যে পাকড়াও করে নিয়ে আসবেন, সে দুঃসাহস ও আমাদের শিক্ষকের ছিল না। আমি কিন্তু ঐ ধরণের ছেলেমানুষি বা দুষ্টামি কখনও কোরতাম না, সাতবছর বয়সেই আমি কোরানের বেশ উল্লেখযোগ্য অংশ শেষ করে ফেলেছিলাম, অথচ অন্যান্যরা তখন পর্যন্ত এক পরিচ্ছদও শেষ করতে পারেনি। আমার ছেলে বয়সের একমাত্র সখের খেলা ছিল, খেলার দূর্গ তৈরী করে তার উপর খেলার কামান স্থাপন করা।

কিছুকাল পরে, মুইন-উল-মুলক্ (যাঁর অন্য এক উপাধি ছিল রুস্তম-এ-হিন্দ) যখন যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন সৈন্য শিবিরের কর্মজীবন দেখার আমার সুযোগ হয়। সেখানে আমরা সৈন্যদের শ্রেণীবদ্ধ সারি সারি তাঁবু দেখেছিলাম। শাসনকর্ত্তার জন্য নির্দ্ধারিত প্রধান তাঁবু। এই তাঁবুতে থাকতো তার শয়নকক্ষ ও নিজস্ব ব্যবহারের অন্যান্য কামরা, একটা তাঁবুতে শুধু দামামা ইত্যাদি রাখা হত। শিবিরের এই সব দৃশ্য আমার মনে স্থায়ী ভাবে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। তাঁবুতে সেনাদের যে ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ পরতে দেখতাম আমি নিজে বাজার থেকে সেই রকম পোষাক কিনে এনে পরতাম, আর মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠতাম। শিবির স্থানান্তরিত হওয়ার সময় আমরা মোট ষোলজন বালক থাকতাম। আমাদের প্রত্যেককে দৈনিক এক টাকা করে খরচ দেওয়া হতো।

এই সময়ে নবাব মুইন-উল-মুলক আমাদের সবার নতুন করে নামকরণ করেছিলেন। এতদিন আমার আগের মনিবেরা আমায় 'জাকির' নামে ডাকতেন, মুইন-উল-মুলক আমার নাম রাখলেন 'তাইমুর,। তিনি আমার প্রতি বড়ই প্রসন্ন ছিলেন। প্রায় তিনি আমায় 'তাইমুরাস' (পারস্য দেশের সম্রাটের নাম) বলে ডাকতেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠার পর, তিনি আমায় 'আগা' বলে ডাকতে শুরু করেন। তিনি তাঁর কোষাধ্যক্ষ খাজা সরা মুহররাম খানকে আমাদের সকলকে প্রাসাদের আদব কায়দা শেখাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুহররাম খান, মুইন-উল মুলকের এক

বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। তাঁর নিজের একপাল হাতী ছিল। তিনি, তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী মীর আবতুল্লার উপর, আমাদের দেখাশুনার ভার দিলেন। তাঁকে বলে দেওয়া হয় যে আমাদেরকে হিন্দুস্থানী ভাষা শেখাবার প্রয়োজন নাই, কেবল তুর্কী ভাষা নিয়েই যেন আমরা থাকি। এ নির্দেশও ছিল যে আমাদের সঙ্গে বাইরের কোন লোক যেন মেলামেশা না করে।

মুইন-উল-মুলক খুব প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়তে বসতেন। ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের সকলকে (আমরা তখন মোট আটজন বালক ছিলাম) ডাক দিতেন এবং তাঁর সঙ্গে নামাজে দাঁড়াতে বলতেন। কেউ অনুপস্থিত থাকলে তাকে তিরস্কার করতেন। বেলা নয়টা আন্দাজ তিনি দরবার শুরু করতেন এবং বখশীর প্রেরিত সৈন্য বিভাগের কাগজপত্র পরীক্ষা করতেন। তারপরে তাঁর সাধারণ সহকারী নবাব ভিকার খান মুইন-উল-মুলকের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাঁরা প্রায় ঘণ্টা খানেক আলাপ আলোচনা করতেন। এর পর সুবাদার মধ্যাহ্ন ভোজন ও বিশ্রামের জন্য অন্দর মহলে যেতেন। মগরেবের নামাজের পর মুইন-উল-মুল্‌ক্‌ কিছুক্ষণ আবার দফতরের কাজকর্ম করতেন এবং এই সময়ে তিনি দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করতেন। এর পর মৌলভী ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁর নিকট আসতেন। তাঁরা কোরান এবং বিভিন্ন আরবী পুস্তক পাঠ করে তাঁকে শোনাতেন। এঁরা বিদায় হলে সরকারী কর্মচারীরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে হাজির হতেন, দফতরের কাজ-কর্ম সমাপ্ত হলে তিনি নবাব ভিকার খানের সঙ্গে আবার যুক্তি পরামর্শে রত হতেন। রাত্রের আহার তাঁরা তুজনে একত্রে সমাধা করতেন। আহার শেষে সুবাদার কিছুক্ষণ নর্তকীদের নৃত্যগীত উপভোগ করতেন এবং তার পর শয়নাগারে প্রবেশ করতেন। সাত বছর ধরে আমি তাঁর এই একই দৈনিক কর্মসূচী দেখেছি।

এই সময় আহম্মদ শাহ আবদালী স্থির করেন যে তিনি পাঞ্জাব আক্রমণ করবেন (১৭৪৯ খ্রীঃ আঃ)। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঝিলাম পার হলেন। তাঁর এই আক্রমণের সংবাদ পেয়ে মুইন-উল-মুলক্‌ লাহোর থেকে যুদ্ধ যাত্রা কোরলেন।

আফগানেরা তখন লাহোর থেকে পনের মাইল দূরে ছিল। এখানে কয়েকদিন ধরে তুইদলের ভেতর যুদ্ধ চলল। মুইন-উল-মুলকের অগ্রভাগের তুই তিন হাজার মোগল সৈন্য আফগানদেরকে পরাস্ত করে। আহম্মদ শাহ আবদালী তখন শান্তির প্রস্তাব পাঠালেন। মুইন-উল-মুল্‌ক্‌ মৌলভী আবতুল্লাহ নামে এক অভিজ্ঞ কূটনৈতিক কর্মচাবীকে শান্তির শর্ত স্থির করার ভার দেন। বিরুদ্ধ দলের মধ্যে শান্তি স্থাপনের পর আহম্মদ শাহ্‌ আফগানিস্তানের দিকে প্রস্থান করেন এবং সাফল্য অর্জন করে মুইন-উল-মুলক লাহোরে ফিরে আসেন। কিছুকাল পূর্বে নাসির খান নামক এক ব্যক্তি কাবুলে মোগলের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আহম্মদ শাহ আবদালী সেখানে ক্ষমতা দখল করলে তিনি কাবুল ত্যাগ করে দিল্লীর দিকে পলায়ন করেন। দিল্লীতে কেউ তাঁর প্রতি মনোযোগ না দেওয়াতে, তিনি সেখান থেকে লাহোরে এসে উপস্থিত হন। সেখানে মুইন-উল-মুল্‌ক্‌ তাঁকে খুব সমাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে শিয়ালকোটসহ চারটি মহলের ফৌজদারি পদে নিযুক্ত করেন। তিনি নাসির খানকে বল্লেন "মহালের শাসনকার্য উত্তমরূপে পরিচালনা করবেন। এই সব মহাল থেকে যে খাজনা আদায় হবে, তা থেকে আপনি এক সেনাদল গড়ে তুলুন, যাতে তু এক বছরের মধ্যে আপনার অধীনে এক উপযুক্ত সেনাদল জমা হতে পারে। খোদার মর্জি হলে আমি আপনাকে কাবুলের সুবাদারীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবো। তখন আহম্মদ শাহ আবদালী ঐ প্রদেশ থেকে বিতাড়িত হবে এবং প্রদেশটি মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে আবার যুক্ত হবে।" তাঁর কাছে এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে নাসির খান শিয়ালকোট যাত্রা করেন এবং সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে কামরুদ্দিনের (মুইন-উল-মুলকের পিতার) মৃত্যুর পর মনসুর আলি খান (সাফদর জঙ্গ) আহম্মদ শাহের প্রধান উজির নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি (মনসুর আলি খান) এই সময় আশঙ্কা করেন যে ভূতপূর্ব উজিরের পুত্র হিসাবে, মইন-উল্‌ মুল্‌ক্‌ও বোধ হয় মনে মনে ঐ পদ লাভ করবার উচ্চাশা পোষণ করেন। এইজন্য তিনি গোপনে নাসির খানকে এই সংবাদ পাঠালেন

যে তিনি নাসির খানকে লাহোরের সুবাদারীতে নিযুক্ত করতে রাজী আছেন এই সর্তে—যে নাসির খান, মুইন-উল-মুল্‌ক্‌কে পরাস্ত ও নিহত করবেন। মনসুর আলীর এই কথায় বিশ্বাস করে নাসির খান, মুইন-উল-মুলকের সঙ্গে শত্রুতা শুরু করে দিলেন। মুইন-উল-মুলকের অধীনস্থ প্রায় হাজার খানেক উজবেক সৈন্য তিনি ভাঙ্গিয়ে নিজ সৈন্যদলে নিয়োগ করতে সমর্থ হলেন।

নাসির খানের এই বৈরী আচরণের কথা জানতে পেরে তার বিরুদ্ধে মুইন-উল-মুলক শিয়ালকোটের দিকে অভিযান করলেন। তাঁদের ভিতর কিছুদিন যুদ্ধ চলার পর নাসির খান পরাজিত হয়ে দিল্লীর দিকে পলায়ন করেন। অতঃপর মুইন-উল-মুল্‌ক্‌ কালানৌরে কিছুদিন কাটিয়ে লাহোর প্রত্যাবর্তন করেন।

মুইন-উল-মুলক আমাদের প্রত্যেককে একটি করে সোনার আংটি, তলোয়ার ও কোমরবন্ধ উপহার দিয়েছিলেন। আমাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য তিনি তিনটি হাতীও মোতায়েন করেন। এরপর আমাদের প্রত্যেককে একটি করে ঘোড়াও উপহার দেওয়া হয়। এই সময় সুবাদার সাহেব আমাদের নির্দ্দেশ দেন, বিভিন্ন চারু ও কারু-শিল্প শিক্ষায় মনোনিবেশ করার জন্য ; প্রত্যেকটি শিল্প শিক্ষার জন্য তিনি দুই মাস কাল সময় নির্দ্ধারণ করে দেন। ঐ সব বিদ্যায় আমরা কতটা পারদর্শিতা লাভ করলাম, মাঝে মাঝে তিনি নিজে পরীক্ষা করে দেখতেন। একদিন তিনি কতকগুলি নক্সা চিত্র দেখছিলেন এবং আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে তিনি বল্লেন—"চিত্র শিল্প সব স্তরের লোকের কাছেই সমাদর লাভ করে থাকে। এই বিদ্যা তোমাদের উত্তম রূপে আয়ত্ত করা উচিৎ।" তাঁর এই কথা শুনে আমার চোখে জল ভরে এল। আমি বল্লাম, "জনাব, শিল্পকলা আমার জীবনে কি কাজে আসবে যে আমি এর সাধনা করবো ?" আমার কথা শুনে তিনি মুচকি হেসে একটা কাগজ নিলেন এবং তাঁর ওপর একটা ছবি একে আমায় দেখালেন এবং আমায় বল্লেন "তোমাদের উচিৎ প্রত্যেক বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করা, যাতে ভবিষ্যতে তোমরা সর্বত্রই সম্মান অর্জন করতে পার।"

মুইন-উল-মুল্‌ক্‌ ও মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, মনসুর আলি খান সফদার জঙ্গের ভেতর শত্রুতা ছিল। তিনি (মনসুর আলি খান) শাহ্‌নাওয়াজ খানের (ভূতপূর্ব সুবাদার জাকারিয়া খানের পুত্র) সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। মনসুর আলি খান, শাহ্‌নাওয়াজ খানকে বল্লেন "লাহোরের সুবাদারীর পদ আপনারই প্রাপ্য; এ পদ লাভ করার জন্য আপনার সবিশেষ যত্ন নেওয়া উচিৎ। আপনার কর্তব্য, প্রথমে মুলতান অধিকার করা এবং তারপর লাহোর দখলের জন্য তোড়জোড় শুরু করা।" তারপর তিনি মুলতানের শাসনকর্তা পদের লিখিত নিয়োগ-পত্র শাহনাওয়াজ খানের হস্তে প্রদান করলেন। নিয়োগ-পত্র পাওয়া মাত্র, শেষোক্ত ব্যক্তি মুলতানে পৌঁছে সৈন্য-সংগ্রহ করতে শুরু করে দেন।

যে সব মোগল সেনা প্রথমে দলত্যাগ করে নাসির খানের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু পরে আবার মুইন-উল-মুলকের সেনাদলে নাম লেখায়, তারা এখন আবার শাহনাওয়াজ খানের দলে গিয়ে যোগ দিল। এই সৈন্য-বলে গর্বিত হয়ে নাসির খান, মুইন-উল-মুল্‌ককে এই মর্মে এক পত্র প্রেরণ করেন যে তিনি লাহোরে তার পিতার কবর জেয়ারত করতে ইচ্ছুক, সেজন্য তিনি কয়দিনের জন্য এই শহরে আসতে চান। মুইন-উল-মুল্‌ক্‌ তাঁর এই আবেদনে প্রায় সম্মতি দিয়ে ফেলেছিলেন কিন্তু তাঁর পরিষদরা আপত্তি জানাল। তারা শাহনাওয়াজ খানের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি মুইন-উল-মুলকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কি রকম চালাকি ও শঠতার সঙ্গে সে আপন অগ্রজকে বন্দী করে ক্ষমতা দখল করেছিল, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিল। মুইন-উল-মুল্‌ক্‌ তখন শাহনাওয়াজ খানকে অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে লাহোরে আসার অনুমতি দেন। এই উত্তর পাওয়া মাত্র শাহনাওয়াজ খান তার মুখোশ খুলে ফেল্লেন এবং ঘোষণা করেন যে তিনি এক সৈন্যদল নিয়ে লাহোরে যাবেন, বল-পূর্বক সেই প্রদেশ অধিকার করবেন, কারণ সে প্রদেশ ন্যায্যতঃ তাঁরই প্রাপ্য।

এইভাবে পরিস্থিতি বেশ দানা বেঁধে উঠল। ইসমৎ খান ও রাজা কাওরা-মলের অধীনে মুইন-উল-মুল্‌ক্‌ এক সুসজ্জিত সৈন্যদল পাঠালেন। এককালে

এই দুজন যথাক্রমে শাহনাওয়াজ খানের দেওয়ান ও মুন্সীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুইন-উল-মুল্‌ক্‌ এদের বন্দী করে নিয়ে এসে কিছুদিন পরে মুক্ত করে দেন এবং তার অনুগ্রহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এঁরা তখন মুলতানের দিকে যাত্রা করলেন। সেখানে যে যুদ্ধ হয় তাতে ইসমৎ খান নিহত হলেন, কিন্তু রাজা কাওরামল জয়লাভ করেন এবং শাহনাওয়াজ খান প্রাণ হারান। পরে রাজা কাওরামল মুলতানে এক শক্তিশালী শাসন কায়েম করেন। যে সব মোগল সেনা শাহনাওয়াজ খানের দলে যোগদান করেছিল, সৈয়দ কলিমুদ্দিন খান ও মোহাম্মদ সাইদ্‌ খানের সুপারিশে তাদেরকে মুইন-উল-মুলকের সেনা-দলে পুনর্বহাল করা হোল।

ইতিমধ্যে প্রাসাদের দাসদের মধ্যে যে সব অল্পবয়স্ক বালক ছিল, তাদের শিক্ষার ব্যাপারে, নবাব মুইন-উল-মুলক গভীর মনোযোগ দিতে থাকলেন। এই কাজের জন্য নিযুক্ত এক অভিজ্ঞ কর্মচারীর তত্বাবধানে আমরা বন্দুক ছোঁড়া এবং অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করা শিক্ষালাভ করতে লাগলাম। দরবারের আদব কায়দার শিক্ষা ও আমাদের দেওয়া হতো, আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন।

এতদিন পর্যন্ত সুবাদারের রন্ধনশালা থেকে আমাদের খাবার পাঠান হত। কিন্তু এখন থেকে আমাদের অনুরোধে দৈনিক এক টাকা ও কয়েক আনা করে দৈনিক ভাতা হিসাবে আমাদের প্রত্যেককে দেওয়া হতে লাগল। আমাদের তত্ত্বাবধায়ক জানির উপর আমাদের খাদ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হোল। মুইন-উল-মুল্‌ক্‌ বলতেন "আমি চাই তোমরা প্রত্যেক বালক যেন স্বাস্থ্যবান ও নানা গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিরূপে গড়ে ওঠো। তা হলেই একদিন দোয়াব চারমহল মুলতান বা কাশ্মীরের শাসনকর্তার মত উচ্চপদ পাবার প্রত্যাশা তোমরা করতে পারবে। শিক্ষিত হয়ে ওঠার কাজে যদি তোমাদের মনোবল না থাকে তাহলে সারাজীবন চল্লিশ টাকা বেতনের চাকর হয়েই তোমাদের পচে মরতে হবে।" মুইন-উল-মুলক আমাদের খুবই স্নেহ করতেন। যখন তাঁর মা সোলা পুরি বেগম (উজির কামরুদ্দিনের বিধবা পত্নী) দিল্লী থেকে লাহোরে আসেন,

মুইন-উল-মুল্‌ক্‌ আমাদের সকলকে তার সামনে নিয়ে গিয়ে পুত্র বলে পরিচয় দেন।

এই সময় আমি কাসিম খানের সঙ্গে পরিচিত হই। সে ছিল বাল্‌খ থেকে সদ্য-আগত এক মোগল যুবক। প্রথমে তাকে সুবাদারের দপ্তরে পার্শ্বচরের পদে নিযুক্ত করা হয়। সুযোগ মত তার হয়ে সুবাদারের কাছে সুপারিশ করার জন্য সে আমাদের প্রায়ই অনুরোধ জানাত। আমরা তার সে অনুরোধ রক্ষাও করেছিলাম। সুবাদারের আলোকিত খাস্‌-কামরায় আমরা সকলে সমস্বরে হাফিজের কবিতা আবৃত্তি করতাম। কিছু দিনের মধ্যেই কাসিম খান মুইন-উল-মুলকের অনুগ্রহভাজন হয়ে উঠতে সমর্থ হয়। তার দুই ভাই আলম জান ও আরিফ জানও বাল্‌খ্‌ থেকে এসে উপস্থিত হয় এবং মুইন-উল-মুলকের অধীনে চাকুরী পায়। উত্তরকালে কাসিম খানের আরও উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু, প্রথম জীবনে সে আমার দ্বারা কি ভাবে উপকৃত হয়েছিল তা কোন দিন বিস্মৃত হয় নি। আমার সঙ্গে সে সব সময় সহৃদয় ব্যবহার করতো। নবাব মুইন-উল-মুলক তার মোগল সেনাদের প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতেন। এই সেনাদল শিখদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা হতো ; সেনাদের ভিতর খাজা মিরজা খান তাঁর কর্মদক্ষতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য নবাবের বিশেষ প্রীতিভাজন হয়ে উঠেছিলেন।

[ক্রমশঃ]